

# সহযাত্রী

## শঙ্করলাল ভট্টাচার্যের গল্প

আমি প্যারিস থেকে জার্মানির কলোন শহরে যাচ্ছিলাম। ভেবেছিলাম সাত ঘন্টার যাত্রাটা একটা ডিটেকটিভ নভেল পড়েই কাটিয়ে দেব। পরে দেখলাম নভেলটা মোটেই তারিয়ে তারিয়ে পড়ার জিনিস না। ডিটেকটিভ নভেলের চেয়ে থ্রিলারের উপাদানই এতে বেশি। এদিকে থ্রিলারে আমার চট করে মন বসতে চায় না। শার্লক হোমস বা পোয়ারো-র ফ্যান আমি, বুদ্ধির খেলা দেখতেই ভালোবাসি? এই নভেলটা আমাকে বড্ড বেশি ছুটোছুটি করাচ্ছিল। আমি দুম করে বইটা বন্ধ করে একটা সিগারেট ধরিয়ে বসলাম। ১২আর জানালার বাইরে চোখ মেলে দেখবার চেষ্টা করলাম স্যাঁকেতা স্টেশন আসার উপক্রম হল কিনা। আর তখনই আমার নজরে পড়ল সামনে বসা প্রৌঢ় ভদ্রলোকের উৎসুক মুখটি। ট্রেনে ওঠার সময় এই ভদ্রলোকটি আমার সামনে বসেছিলেন কিনা মনে করতে পারলাম না।

প্যারিস ছাড়ার পর আর কেউ তো এই কামরায় ঢোকেনি। তাহলে ইনি কখন এলেন? আর ওভাবেই বা আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ওরকম অসহায় হাসিই বা হাসছেন কেন? উনি কি আমাকে চেনেন? দূর, তাই-বা কী করে হবে? আমি ভারতীয় ছাত্র, মাত্র সাত মাস আছি প্যারিসে, আমার সঙ্গে এরকম

কারও কোনো পরিচয় ঘটেনি এর মধ্যে। দু-চার জন বয়স্ক প্রফেসর ছাড়া আমি এই বয়সের বেশি লোকের ধারপাশেও ঘেঁষিনি এতদিনে। তাহলে?

একটা জিনিস আমাকে ভীষণ আকৃষ্ট করেছে ভদ্রলোকের চেহারার মধ্যে। সেটা কী? আমি অনেকক্ষণ ধরে ওর গোটা চেহারার খুঁটিনাটি নজর করে দেখলাম। কই, না তো! চেহারার কোথাও তো কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নেই— না নাকে, না চোখে, না চুলে, না ঠোঁটে। না হাতে, না দেহে, না পোশাকে, না হাবেভাবে। পাছে ভদ্রলোক বিরক্ত হন তাই এক ঝটকায় বইটা ফের তুলে নিয়ে তাতে মন দিলাম। কিন্তু না, মন কিছুতেই আর বইতে গিয়ে বসছে না। ভদ্রলোকের দিকে না তাকিয়েও আমি বুঝতে পারছি যে, ভদ্রলোকও আমাকে নিয়েই কিছু একটা ভাবছেন। হয়ত পূর্বের মতো সেরকম মিটিমিটি হাসছেনও। আমাকে নিয়েও ভদ্রলোকের মনে কিছু কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছে। আমার ভয়ানক ইচ্ছে হল আয়নাতে একবার নিজের মুখটা দেখার। আমি বইটা ফের সরিয়ে রেখে উঠে দাঁড়িলাম কম্পার্টমেন্টের আয়নাটার মুখোমুখি হব বলে। একটা আলতো ঝাঁকানি দিলাম কলারের টাইটায়, আর বেশ সপ্রতিভ ভঙ্গিতে দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করলাম আয়নার মধ্যে। আর চমকে উঠলাম আয়নায় প্রতিফলিত দৃশ্যটি দেখে।

আমার বুঝতে এতটুকু দেরি হল না, কেন আমার সামনে উপবিষ্ট প্রৌঢ় ভদ্রলোক সমানে আমাকে দেখে যাচ্ছিলেন। কারণ ওঁর সুটের রং ও কাপড়, জামার কাপড় ও রং, টাই-গোঁফ চশমা ও টুপি হবহ আমার মতন। আর দু-জনের চেহারা দু-টিও এক। শুধু ফরাসি ভদ্রলোকের গায়ের রংটা একটু বেশি ফর্সা, আর বয়সের জন্য চেহারাতেও কিছুটা টিলেঢালা ব্যাপার। নতুবা ওঁকে যেকোনো লোক দেখলে আমার ভবিষ্যৎ চেহারা আঁচ করতে এবং আমাকে দেখলে ওর বিগত যৌবন সম্পর্কে ধারণা করতে পারবে। মুখে একটু রংচং বুলিয়ে আর চোখে একটা কালো চশমা পরে আমি অনায়াসেই ওঁর হয়ে

কোথাও হাজিরা দিতে পারি। আর উনিও যদি একটু রংটং মেখে যুবা সাজেন তো... না আর ভাবতে পারলাম না। আমার মাথাটা কীরকম ভেতরে ভেতরে দুলতে লাগল। আমার মনে হল আমার সামনে আমার একটা জীবন্ত ক্যারিকেচার। ভীষণ রাগও হল ওঁর ওপর, আবার কিছুটা মায়াও। আমি স্থির করলাম গোটা জার্নিতে ওঁর দিকে আর তাকাবই না। তাই ফের থ্রিলারটা উঠিয়ে নিয়ে মনসংযোগ করার চেষ্টা করলাম।

কিন্তু একেকটা সময় থাকে যখন মনসংযোগ দিয়ে কিছু করা জেগে জেগে ঘুমোনের মতো অস্বস্তিকর, অসম্ভব ব্যাপার হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রেও আমার ঠিক তাই হল। আমি বই পড়ার বদলে সামনে বসা মানুষটিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে ও তাঁর চরিত্র বিশ্লেষণ করতে লাগলাম। আমি মনে মনে বিভিন্ন পোশাকে ওকে সাজিয়ে আমার চেহারার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে লাগলাম। হঠাৎ কি ভেবে ওকে ধুতি-পাঞ্জাবিতেও কল্পনা করলাম। কিন্তু প্রতিবারই আমার গায়ে কাঁটা দিল যখন খেয়াল হল যে লোকটার সঙ্গে আমার প্রৌঢ় চেহারার কোনোই ফারাক নেই। ওই অত শীতেও আমার শরীরটা ক্রমশ উষ্ণ হয়ে উঠতে লাগল। আমার একটা অকারণ ভয়ও হল সহসা। লোকটা আসলে আমিই নই তো?

শেষের কথাটা মনে উদ্বেক হতেই আমার স্বেদ চুলোয় গেল। আমি ফিরে আরেক বার ভদ্রলোকের দিকে না তাকিয়ে পারলাম না। কিন্তু যতক্ষণে মুখ তুলে ফের তাঁর দিকে তাকিয়েছি ততক্ষণে দেখি তিনি নির্বিকার আমার সুটকেসটাই র্যাক থেকে নামিয়ে নিয়ে কামরার বাইরে হন্টন লাগিয়েছেন। কারণ ট্রেন তখন এসে দাঁড়িয়েছে স্যাঁকেতা স্টেশনে।

প্রচন্ড আতঙ্ক হল ভেতরে ভেতরে। এ কি! আমার সুটকেস নিয়ে লোকটা চম্পট দিল বিন্দুমাত্র ক্রক্ষেপ না করে। আমি ছুট লাগলাম ওঁর পিছনে। কিন্তু

করিডরে পা ফেলে লোকটা যে কোথায় উধাও হল তা এতটুকু হদিশ মিলল না। ভয়ের চোটে কোটের ভেতরের পকেটে হাত চালিয়ে দিলাম। না, পাসপোর্ট টিকিট টাকার ওয়ালেট আর অন্যান্য পরিচিতিপত্র সব ঠিক আছে। সুটকেসটার মধ্যে রাখা জামাকাপড়, বইপত্র আর শেভিং সেটটা উধাও হল।

স্যাঁকেতাঁ স্টেশনে ট্রেন দাঁড়িয়ে, কিন্তু আমার প্ল্যাটফর্মে নামার সাহস হচ্ছে না। যদি ট্রেন ছাড়ে তাহলে ওঠার আর বিন্দুমাত্র সুযোগ থাকবে না। এই পাগল করা শীতের মধ্যে এই স্টেশনে পায়চারি করতে হলে নিউমোনিয়াকে সঙ্গী করে কলোন পৌঁছাতে হবে আগামীকাল। আমি মানে মানে নিজের কামরায় ফিরে, নিজের জায়গাটিতেই বসে পড়লাম। আর তখনই চোখে পড়ল সামনের র্যাকে ঠিক আমার মতন একটা সুটকেস, যেটা নির্ঘাৎ ওই ভদ্রলোকের ফেলে যাওয়া লাগেজ। তৎক্ষণাৎ ঠিক করলাম ওই সুটকেসটাই হস্তগত করে আমি কলোন স্টেশনে নামব।

ট্রেন এখন ফ্রান্সের বর্ডার ক্রস করে জার্মানিতে ঢুকল। আমি বুকে আঙুল টিপে দেখে নিলাম পাসপোর্ট, টিকিট সব ঠিক আছে কিনা। ভীষণ বাসনা হল সামনের র্যাকের সুটকেসটা খুলে দেখি ওতে কী আছে। আমার কাজে লাগে কিনা। কিন্তু ভয় হল। আমার চাবিতে যদি সুটকেসটা না খোলে তাহলে পাশের লোকজনের মনে সন্দেহ জাগতে পারে। ঠিক করলাম সুটকেসটা নিয়ে একেবারে হোটলে গিয়েই খুলব।

একটু পরে আখেন স্টেশনে জার্মান পুলিশ এসে পাসপোর্ট চেক করতে লাগল। আমার কাছে আসতেই আমি পাসপোর্টটা কোটের ভেতরের পকেট থেকে বার করে দিলাম। পুলিশটা কোনো ছাপ না মেরেই আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, ডাক্সেসন! অর্থাৎ থ্যাঙ্ক ইউ।

আমি পাসপোর্টটা হাতে নিয়ে বোকার মতন বসে রইলাম খানিকক্ষণ। তারপর সেটাকে পকেটে গলিয়ে দেওয়ার বদলে খুলে ফেললাম। আসলে একটা গুপ্ত ভয় তখন আমার বুকের মধ্যে লাফালাফি করছে। লোকটা আমার পাসপোর্টে ছাপ মারল না কেন?

ইউরোপের কোনো নাগরিক হলে ট্রেনে অন্তত ওই ছাপটাপ মারার রেওয়াজ আর নেই। কারণ ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে ভিসার চল উঠে গেছে অনেক দিন যাবৎ। কিন্তু আমি তো ভারতীয়, আমার বইতে তো ছাপ মারতেই হবে। আমি ভয়ে ভয়ে চোখ চাললাম পাসপোর্টের পরিচয়পত্রের অংশের দিকে। আর সঙ্গে সঙ্গেই আমার ভেতরের রক্ত প্রায় হিম হয়ে বসল। আমি দেখলাম আমার পাসপোর্টে নাম লেখা আছে মঁসিয়ুর মার্সেল রেমঁ এবং ছবির জায়গায় সাঁটা আছে কিছুক্ষণ পূর্বেও আমার সামনে বসা ভদ্রলোকটির ফটো। যে চেহারা আমার আশঙ্কা, আমারই হয়ে উঠবে আর বছর ত্রিশেক বাদে। আমি দড়াম করে পাসপোর্টটা বন্ধ করে বুকপকেটে গুঁজে দিলাম। আমার সমস্ত শরীর ঘেমে উঠেছে। আমার ভেতরে মৃত্যুভয়ের সমতুল্য একটা ভয় জেগে উঠেছে।

এরপর কখন কোন স্টেশন পার হলাম, কখন, কাকে টিকিট দেখালাম, কখন রাত দুটো বাজল আর কখন, কীভাবে কলোন স্টেশনে নেমে ট্যাক্সি ডেকে পূর্বনির্ধারিত এক হোটেলে এসে মার্সেল রেমঁর নামে ঘর বুক করে এই ঘরে এসে উঠলাম—আমার আর সঠিক মনে পড়ছে না। এইমাত্র আমি আমার চাবি ঘুরিয়ে রেমঁর সুটকেস খুলে দেখলাম আমারই জামাকাপড় বইপত্র ও শেভিং সেটে গুঁর সুটকেস বোঝাই। বুঝতে পারছি না কিছুতেই, সুটকেসটা গুঁর না আমার।

কিন্তু এখন আর কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। আমি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখছি ওতে আমার নয়, মার্সেল রের্মর প্রতিবিশ্ব পড়েছে। কিংবা বলা চলে আমি সাত ঘণ্টার মধ্যে ত্রিশ বৎসর বেশি বয়সের একটা মানুষ হয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছি। আমার চুলে ইতস্তত পাক ধরেছে, চামড়া কিছুটা আলগা হয়ে গেছে, চোখের পাওয়ার কিছুটা বেড়েছে এবং গায়ের রং কিছুটা ফর্সা হয়ে গেছে। আমি রাজীব মিত্র, একজন বয়স্ক সাহেব বলে কলোনের এক নামী হোটেলের কক্ষে প্রশস্ত আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছি।

আমার ভয়ানক ক্লান্তি বোধ হচ্ছিল। আমি জামাকাপড় খুলে উলঙ্গ হয়ে বিছানায় টান হয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘুমিয়ে পড়তে পড়তেও আমার মনে হল এই ঘুম থেকে আমি হয়তো আর জাগব না।

কিন্তু জাগলাম। প্রতিদিনের মতোই জাগলাম। ঠিক সাতটায়। শুয়ে শুয়ে বিছানায় বেড-টি খেললাম। আরেকটু পরে ব্রেকফাস্টের সঙ্গে সকালের কাগজ এল। ওমলেট আর চা খেতে খেতে জার্মান কাগজের পাতা ওলটাতে লাগলাম। পড়তে তো পারছি না। হঠাৎ একটা ছবি ও খবরে এসে দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল। এ কী! এ তো আমারই মুখ ছাপা হয়েছে কাগজে! কেন ছাপল? কোথায় পেল আমার ছবি?

আমি বেল টিপে ওয়েটারকে ডাকলাম। বললাম, এই খবরটা পড়ে আমার ইংরেজিতে মানে করে দাও। ছেলেটি ওর ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে মানে করতে গিয়ে বলল, প্যারিসের সোরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের ছাত্র ভারতের রাজীব মিত্র গতকাল রাত্রে স্যাঁকেত স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে নিজের নেকটাই দিয়ে একটি ফরাসি মেয়েকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করে এবং পরে ওই নেকটাই নিজের গলায় বেঁধে ওয়েটিং রুমের সিলিং-এ ঝুলে পড়ে। জানা যাচ্ছে ফরাসি

মেয়েটির সঙ্গে রাজীবের প্রেম ছিল। ওদের দেখা করারও কথা ছিল স্যাঁকোঁয়  
রাত সাড়ে নটায়।

ওয়েটার চলে গেছে। আমি আমার ব্রেকফাস্ট ও সকালের কাগজ হাতে নিয়ে  
খাটে বসে আছি। আমি জানি না আমি এরপর কোথায়, কেন যাব। আমার  
ভীষণ দুঃখ হচ্ছে নিজের জন্য। আমার চোখে জলও ভেসে উঠছে। কেন আমি  
অকারণ অন্য একটা লোকের বাকি জীবনটা অতিবাহিত করতে যাব? আমি  
তো তাঁর বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়বর্গ, পারিপার্শ্বিক কিছুই চিনি না। এটা কি  
কোনো জীবন হতে পারে?

হঠাৎ আমার নজরে পড়ল আমার গলায় নেকটাইটা। বাঁচালে এই খুদে  
জিনিসটাই আমাকে বাঁচাতে পারে। আমি হঠাৎ উৎসুক হয়ে সিলিং-এ একটা  
আংটা খুঁজছি। আছে কী? না থাকলে?